সাধক কবি বিজয় গুপ্ত।

বৌদ্ধ ধর্ম্মের পতনের পর যখন ভারতে শৈব ও শাক্তের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং ঘোর বিরোধ চলিতেছিল, শ্রীচৈতন্যের নাম সঙ্কীর্ত্তণে যখন বাঙ্গালার গগন পবন মুখরিত হয় নাই ও প্রেমের স্রোত বহিয়া যায় নাই, তখন পূর্ব্ববঙ্গের এক সমৃদ্ধশালী পল্লীতে সাধক কবি বিজয় গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। বিজয় এক উচ্চ দরের ভক্ত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের যেমন পতিতপাবন হরি, বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের যেমন রাধাকৃষ্ণ, রামপ্রসাদের যেমন জগন্মাতা শ্যামা—বিজয়েরও তেমনি ছিলেন নাগমাতা মনসাদেবী। শয়নে স্বপনে জাগরণে—অষ্টপ্রহরই তাঁহার ধ্যান ছিল মনসাদেবীর মূর্ত্তি। তাঁহার কামনার ধন, বক্ষের পঞ্জর—অন্তরের ঠাকুরাণী ছিলেন মনসাদেবী।

নমঃ নমঃ জগন্মাতা সর্ব্বসিদ্ধিদায়িনী।
তুমি সূক্ষ্ম, তুমি মোক্ষ, তুমি বিশ্ব জননী॥
কে তোমায় পূজিতে পারে কাহার শকতি।
সেই সে পূজিতে পারে যে জানে ভকতি॥
স্থাবর জঙ্গম তুমি, তুমি চারি বেদ।
ব্রহ্মা, শঙ্কর, হরি, তোমাতে নাহি ভেদ॥

এইরূপ উক্তি প্রকৃত ভক্তের হৃদয় হইতেই উত্থিত হইয়া থাকে।

বাঙ্গালা সাধকপ্রবরের সঙ্গীতে ধ্বনিত হইতেছিল, সুলতান হোসেন শাহের সময়ে, সাধকপ্রবর তাঁহার "মনসামঙ্গলে" নিজ পরিচয় ও বাসস্থান নির্দ্দেশ সময়ে যাহা লিখিয়াছেন তাহা ৺রোহিণীকুমার সেন প্রণীত "বাকশ" হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

"যেন মতে পদ্মাবতী করিলা সন্নিধান।
তেন মতে করে বিজয় গীতের নির্ম্মাণ॥
ঋতুশূন্য বেদশশী পরিমিত শক।
সুলতান হোসেন শাহ, নৃপতি তিলক॥
সংগ্রামে অর্জ্জুন রাজা, প্রভাবেতে রবি।
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূর্ব্বে ঘণ্ডেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম, পণ্ডিত নগর॥

ঋতু শূন্য বেদশশীকে (অঙ্কস্য বামা গতিঃ) অর্থাৎ ১৪০৬ শকে (১৪৮৪ খৃঃ অঃ) এই গ্রন্থ রচনা আরম্ভ হয়। বঙ্গীয় ইতিহাসে ষ্টুয়ার্ট সাহেব হোসেনের সিংহাসনারোহণ কাল ১৪৯৯ খৃঃ অঃ নির্দ্দেশ করিতেছেন ; কিন্তু বিজয় গুপ্তের মতানুসারে তিনি ইহার পঞ্চদশ বৎসর পূর্ব্বেও বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যতজন পাঠান নৃপতি অস্মদ্দেশে রাজত্ব করিয়াছেন, তন্মধ্যে হোসেন শাহই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ইনি যেরূপ ধার্ম্মিক, তদ্রূপ বীর, ন্যায়দর্শী এবং তেজস্বী ভূপতি ছিলেন।"

বিজয় গুপ্তের জন্মভূমি ফুল্লশ্রী নামক গ্রামের উভয় পার্শ্ব বিধৌত করিয়া ঘাঘর ও ঘণ্টেশ্বর নামে দুই মহানদ প্রবাহিত হইত, উহাদের চিহ্ন এখনও বর্ত্তমান আছে। ঘাঘরের গর্ভে বহুযোজন ব্যাপী বিলের উদ্ভব হইয়াছে এবং উহা অতি ক্ষীণকায়ে প্রবাহিত হইতেছে। ঘণ্টেশ্বরের গর্ভে বহুসংখ্যক গ্রাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই নদ আরও ক্ষীণকায়, ইহার তীরে ঘণ্টেশ্বর নামক এক গ্রাম আছে। তথায় প্রতি বৎসর বারুণী উপলক্ষে শত শত স্নানার্থীর সমাগম হয়।

বিজয় গুপ্তের পূর্ব্বে ও তাঁহার সময়ে বাঙ্গালার ঘরে ঘরে গৃহদেবতা ছিলেন মনসাদেবী এবং এখনও পূর্ব্ববঙ্গে ইনি অনেকের গৃহদেবতা। মৌদ্গল্য গোত্রীয় নারায়ণদেব প্রমুখ বহু কবি এই দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। উপরি উক্ত ফুল্লশ্রী গ্রামের নিকটে মোড়াকাঠী নামক গ্রামে মৌদ্গল্য গোত্রীয় চন্দ-উপাধিধারী বহু গৃহস্থের বাস। ইহাদের পুরাতন বাড়ীতে মনসার পূজা হইয়া থাকে এবং এই পূজা সাত, আট পুরুষ পূর্ব্বে প্রথম আরম্ভ হয়। ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিলেন। বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ভগ্নাবস্থায় পড়িয়া আছে। এই সকল দেখিয়া মনে হয়, এই স্থানে এককালে দেবীর পূজার মহাসমারোহ ছিল। রাত্রিকালে গান আরম্ভ হয় বলিয়া "রজনী" হইতে (প্রাঃ রয়ণি) রয়ানি কথার উৎপত্তি। এই গানকে এই কারণে "জাগরণ" বলে। বিজয় গুপ্তের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি নারায়ণদেব এবং এই চন্দ্রবংশ একই গোত্রীয়। ইহাতে অনুমান হয় যে নারায়ণদেব বা তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ-গণের সহিত ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কোন ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক ছিল;—যাহাতে নারায়ণদেবের আরাধ্যাদেবী ইহাদের এত আদরের গৃহদেবতা হইয়াছেন।

সে যাহা হউক অদ্যাবধি সেই বাড়ীতে প্রত্যহ দেবীর পূজা হয়। সারা শ্রাবণ মাস ব্যাপিয়া মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে ৺বিজয় গুপ্তের "মনসামঙ্গল" গীত হইয়া থাকে। ঝড় হউক, বৃষ্টি হউক—প্রতিদিন শত সহস্র নরনারী গীত শুনিতে আসে। শ্রাবণের বারিধারা যেন ভগবতীর করুণাধারা ও তাহার অন্তরালে যেন মায়ের অলক্ষ্য ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়। তারপর আশ্বিন কার্ত্তিকের শেষে শ্রীশ্রী৺শ্যামা পূজান্তে চারি দিন ব্যাপিয়া দেবীর পূজা ও বিজয়গুপ্ত প্রণীত "মনসামঙ্গল" গীত হইয়া থাকে। অস্মদেশে ইহাকে "রয়ানি গান" কহে। দিবাবসানে এই গীত আরম্ভ হয়। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা দলে দলে আসিয়া সমবেত হয়—ভদ্রাভদ্র, ছোটবড় বলিয়া কেহ বাদ যায়না। সে কি আনন্দ! সে কি ভক্তি! একে ভক্ত কবির অন্তর প্রসূত ছন্দলহরী, গায়কগণের সুন্দর বর্ণনাকৌশল ও সুমধুর কণ্ঠস্বর, এবং সমাগত শ্রোতৃমণ্ডলীর ঐকান্তিক আবেগ ও আকুলতা, তদুপরি ভগবতীর কৃপা—এই কয়ে মিলিয়া সেইস্থানে স্বর্গ আনয়ন করে, ভক্তির প্রবাহ ও অশ্রুর বান বহাইয়া দেয় সেখানে রঙ্গমঞ্চের চিত্তচমকপ্রদ দৃশ্যের সমাবেশ নাই, বিবিধ বাদ্য সংযুক্ত সুকৌশলী সঙ্গীত শ্রবণ-যুগল বিকল করিয়া দেয়না। তবুও সেখানে নয়নান্তরালে ভাবের রাজ্য ভাসিয়া উঠে, বহির্জগতের সকল সম্বন্ধ ছিন্ন করিয়া তন্ময়তা আসিয়া পড়ে। এরূপ কেন হয়? অতীত যুগে দেবী মনসা নরনারীর হৃদয়ের যে কতখানি জুড়িয়া ছিলেন ও বর্ত্তমানে জুড়িয়া আছেন—ইহা তাহারই নিদর্শন মাত্র।

এইত গেল পরের দেশের কথা। বিজয় গুপ্তের জন্মভূমি, অতীতের কোন্ কোন্ গৌরব নিদর্শন বুকে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে এবং কি প্রতিদান দিতেছে তাহা দেখিতে হইবে। ফুল্লশ্রী গ্রামে * বিজয় প্রতিষ্ঠিত মনসাদেবী আছেন। কমলদলশোভিত মানসকুণ্ড নামক এক সরোবর তীরে দেবীর মন্দির। বিজয় গুপ্ত নিজ বাটীতেই মনসাদেবীর ঘট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে তাঁহার গৃহ যেখানে ছিল সেইখানে—মন্দিরের অনতিদূরে একখানি সুন্দর কুটীর নির্ম্মিত রহিয়াছে। বিজয় গুপ্ত নিঃসন্তান ছিলেন। তিনি স্বর্গারোহণ

---

* মনসাবাটী যে পল্লীতে অবস্থিত তাহা সচরাচর সিহিপাশা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। নবাবী আমলে এই স্থানে সিপাহীর শিবির সংস্থাপিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার নাম সিপাহীপাশা হয়। সিহিপাশা এই নামের অপভ্রংশ মাত্র।

করিলে তাঁহার সম্পত্তির আয়ে কিম্বা অপর দশজনের দানে একখানি কুটীরের মধ্যেই এতাবৎকাল দেবীর পূজা হইতেছিল, সম্প্রতি কুটীরের পরিবর্ত্তে স্থানীয় একজনদাশয় ধনী ব্যক্তির দ্বারা একটী সুন্দর মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে।

পূর্ব্বকালে ফুল্লশ্রী মনসা পূজার লীলানিকেতন ছিল এবং উহার অপর নাম ছিল মানসী। যথা—

"শিবস্ত চ যথা কাশী, বিষ্ণোর্বৃন্দাবনং যথা
মানসী মনসাদেব্যার, স্ত্রীপূর্য্যাস্ত্রিপুরং তথা"।

এই মানসীতীর্থে দিগ্‌দিগান্তর হইতে নরনারী আগমন করিত। এমন কি, হিন্দুরা যেমন কোন কোন পীরের দরগায় পূজা দিয়া থাকেন, তেমনি অনেক মুসলমানসন্তানও আপনাদের মঙ্গল কামনায় এইস্থানে আসিয়া দুগ্ধ, ফল, ফুল প্রদান করেন।

আজ কালও বহুদূর হইতে আসিয়া পূজা, মানসিক ইত্যাদি প্রদান করিতে এইস্থানে দ্বিপ্রহরে এক বিরাট ব্যাপারের সংঘটন হয়। শত শত লোক প্রসাদ পাইতে চালাঘরে, তথা প্রাঙ্গনে বসিয়া যায়; যেন নিত্যই বিরাট যজ্ঞ লাগিয়া আছে।

ফুল্লশ্রী যে বাস্তবিকই মানসী তাহা নিম্নোক্ত জনপ্রবাদ বিশ্বাস করিলে বুঝা যায়। মনসাদেবীর ঘট নাকি স্বয়ং দেবীর পিতা শঙ্কর দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মার দ্বারা নির্ম্মাণ করাইয়া মর্ত্ত্যে আনয়ন করেন এবং উহা লাটিক নামক এক চণ্ডাল প্রাপ্ত হয়। লাটিকের মৃত্যুর পর ঐ ঘট মানসকুণ্ডে অন্তর্হিত হয়। পুনরায় বিজয় গুপ্ত কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়া অদ্যাবধি পূজিত হইতেছে। ফুল্লশ্রীগ্রামে জাহাজঘাটা বলিয়া একস্থান আছে। জনপ্রবাদ—চন্দ্রপতি সওদাগর (চাঁদবেনে) প্রভৃতি বণিকগণ বাণিজ্যের পথে ঐ স্থানে পূজা দিয়া যাইতেন।

বিজয়গুপ্ত স্বয়ং দেবী কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া "মনসামঙ্গল" রচনা করেন। স্বপ্নাদেশের বিষয় তিনি তাঁহার গ্রন্থে লিখিতেছেন :—

"গা তোল, গা তোল পুত্র কত নিদ্রা যাও।
শিয়রে মনসা তোমার, চক্ষু মেলি চাও।
আজ নিশি অবসানে এড়িয়া বসন।
গীত ছন্দে বর কিছু আমার স্তবন।"

বিজয় এক বৃক্ষতলে বসিয়া পাঁচালী রচনা করেন এবং তাহা তাঁহার মাতুলকে সংশোধন করিতে দেন। মাতুল পাঁচালী সংশোধন করিতেছিলেন এমন সময়ে দেখেন তাঁহার পুরোহিত কন্যা আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে তিনি কি করিতেছেন। তিনি পাঁচালী সংশোধনের কথা বলিলে উক্ত বালিকা কহিল "বিজয় যাহা লিখিয়াছে তাহাই ঠিক, তোমার আর সংশোধন করিতে হইবে না।" এই বলিয়া সে চলিয়া গেল। বিজয়গুপ্তের মাতুল অনুসন্ধানে জানিলেন যে তাঁহার পুরোহিত কন্যা শ্বশুরালয়ে আছেন, এই কার্য্য স্বয়ং মনসাদেবীর তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না। মাতুল মহাশয় আর পাঁচালী সংশোধন করিলেন না, উহা বিজয়কে ফিরাইয়া দিলেন।

বিজয়ের "মনসামঙ্গল" বাঙ্গালা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে কত কবি মনসাদেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন; কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অল্পজনেরই কাব্য এত মধুর হইয়াছে। তাঁহার ভাষা এত মার্জ্জিত যে তাঁহার কবিতা পড়িলে অধুনাতন কোন কবির লিখিত বলিয়া ভ্রম হয়। পূর্ব্ববঙ্গের রামপ্রসাদ নাই বটে, কিন্তু সে অভাব বিজয় গুপ্তের দ্বারা পূর্ণ হইয়াছে। আজি সেই সাধক প্রবর নাই, চারিশত বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার কণ্ঠ নীরব হইয়াছে, সোনার দেহ মাটিতে মিশাইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার ফুল্লশ্রী আছে, বাঙ্গালী উহা লইয়াই জীবন কাটাইয়া দিবে; তাঁহাকে ও তাঁহার আরাধ্যা-দেবীকে কখনও ভুলিবে না।

শ্রীঅতুলচন্দ্র চন্দ।
২য় বার্ষিক শ্রেণী।
বি শাখা, বিজ্ঞান বিভাগ।